বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খন্ড ২৯ বার্ষিক সংখ্যা ১৪১৮

মৌসুমী ক্ষুধা: বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের 'মঙ্গা'র অতীত ও বর্তমান প্রেক্ষাপট

মোহাম্মাদ গোলাম রব্বানী*

১। ভূমিকা

'উন্নয়ন জ্ঞানকান্ড' বা ডেভলপমেন্ট ডিসকোর্স-এ 'মঙ্গা' একটি সাম্প্রতিক প্রত্যয়। আর 'মঙ্গা' পীড়িত মানুষ 'ওপর সাদা ভেতর কালো' (উদ্দিন, ১৯৯৬) 'উন্নয়ন প্রতিনিধি' বা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে নতুন লক্ষ্য। কিন্তু 'মঙ্গা' কোনো সাম্প্রতিক বিষয় নয়। এর শিকড় খুঁজতে হবে ঔপনিবেশিক যুগে বা তারও পূর্বে। ঔপনিবেশিক যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ড় 'মঙ্গা' একটি চলমান বিষয়। সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে 'মঙ্গা'র চরিত্রগত পরিবর্তন এবং এর চলকগুলোর গুণগত তারতম্যের কারণে কোনো কোনো বছর 'মঙ্গা'র প্রভাব খুব তীব্র না হলেও এর নীরব উপস্থিতি বরাবরই থেকে এসেছে। এই শতাব্দীর প্রথম দশকে 'মঙ্গা' বাংলাদেশের 'উন্নয়ন ভাবনা'য় স্থান পায়, এবং সংবাদ মাধ্যমের কল্যাণে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের একটি চিত্তাকর্ষক প্রপঞ্চ হিসেবে আবির্ভূত হয়। কিন্তু 'উন্নয়ন জ্ঞানকান্ডে' 'মঙ্গা' উপস্থাপনের সময় এর যে অর্থ করা হয় তা অনেক সময় 'মঙ্গা'র পরম্পরাগত অর্থ এবং 'মঙ্গা' প্রবণ এলাকার মানুষের 'মঙ্গা' সংক্রান্ড় অভিজ্ঞতার সাথে পার্থক্য তৈরি করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'উন্নয়ন' গবেষকদের ফরমায়েশী 'মঙ্গা পরিবেশনা' 'মঙ্গা'র প্রকৃত চরিত্রকে আড়াল করে।

'মঙ্গা' শব্দটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ত্রিমাত্রিক সাধারণীকরণ সমস্যা চোখে পড়ে। প্রথমত, একটি সমসাময়িক বিষয় হিসেবে 'মঙ্গা'র অর্থনৈতিক প্রপঞ্চ দ্বারা এর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা হয়। কোন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে, কি ধরণের আর্থ-সামাজিক বাস্ড়বতার মধ্য দিয়ে 'মঙ্গা' বিদ্যমান এবং এর অ-অর্থনৈতিক প্রপঞ্চগুলো কী - এসব বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। দ্বিতীয়ত, 'মঙ্গা'র একটি পরম্পরাগত অর্থ আছে এবং গ্রামবাংলার মানুষের জীবনে এর অভিজ্ঞতা অনেক পুরনো। কিন্তু আশ্বিন-কার্তিক (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর থেকে অক্টোবর-নভেম্বর) মাসে দেশের উত্তরাঞ্চলের নির্দিষ্ট কিছু জেলার যে পরিস্থিতিকে 'মঙ্গা' হিসেবে উলেণ্ডখ করা হয় তার যে চরিত্র লক্ষ করা যায় তা 'মঙ্গা'র পরম্পরাগত অভিজ্ঞতা থেকে অনেকটাই ভিন্ন। তৃতীয়ত, 'মঙ্গা'কে 'উত্তর বঙ্গের 'মঙ্গা' হিসেবে উলেণ্ডখ করে সমগ্র উত্তরাঞ্চলের উপর নির্বিচারে 'মঙ্গা' চাপিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, 'মঙ্গা'র প্রভাব উত্তরবঙ্গের সব জেলাতে সমান নয় এবং এর চরিত্রও শ্রেণি ও পেশাভিত্তিক। এই প্রবন্ধে 'মঙ্গা'র ঐতিহাসিকতা খোঁজার মধ্য দিয়ে 'মঙ্গা' বিষয়ে এসব সাধারণীকরণের সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া 'মঙ্গাক্রান্ড়' এলাকার ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ, 'মঙ্গাক্রান্ড়' এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন, 'মঙ্গা' কবলিত মানুষের নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ, এবং 'মঙ্গা' সংক্রান্ড় বিভিন্ন ঘটনা ও 'মঙ্গাক্রান্ড়' পরিবারের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে 'মঙ্গা'র বাস্ড়ব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

* সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

সংবাদপত্রে 'মঙ্গা' সংক্রান্ড় বিভিন্ন সংবাদ ও প্রতিবেদনই 'মঙ্গা' বিষয়টিকে মানুষের সামনে তুলে ধরে। আর এক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের সাংবাদিক মোনাজাত উদ্দিন, লেখক আনিসুল হক প্রমুখ গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এভাবে 'মঙ্গা' বিষয়টি জনসম্মুখে উঠে আসার প্রথম পর্যায়ে, অর্থাৎ ২০০৩ সালে (যে বছর 'মঙ্গা' মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল) আমি 'মঙ্গাক্রান্ড়' এলাকাসমূহ জরিপ করা হয়।[১] এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত মাঠ পর্যায়ের অনেক তথ্যই সেই সময়ে সংগৃহীত। 'মঙ্গা'র সর্বশেষ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার লক্ষ্যে ২০১১ সালে 'মঙ্গা' প্রবণ এলাকাসমূহ পুনরায় জরিপ করা হয়।[২] 'মঙ্গা' প্রবণ অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী একটি জেলার কৃষিজীবী পরিবারে বেড়ে উঠার সুবাদে 'মঙ্গা'র একটি অর্থ আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায়ও বিদ্যমান। কৃষকদের মৌসুমভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকা", ভিন্ন ভিন্ন কৃষি মৌসুমের ভিন্ন ভিন্ন প্রপঞ্চ, কৃষকের মৌসুমী সংকট ও সম্ভাবনা এবং 'মঙ্গা' সম্পর্কিত আমার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান আমি এই গবেষণায় ব্যবহার করেছি।

২। 'মঙ্গা' শব্দের উৎপত্তি ও অর্থ

'মঙ্গা' শব্দটি কবে থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে বাল্যকাল থেকেই আমার নিজের গ্রামাঞ্চলে 'মঙ্গা' শব্দের ব্যবহার শুনে এসেছি। হতে পারে 'মঙ্গা' শব্দটি 'মঙ্গা' প্রবণ অঞ্চলে ব্যবহৃত একটি আঞ্চলিক শব্দ। ঔপনিবেশিক যুগের সরকারি নথিপত্র, গেজেটিয়ার এবং সমকালীন ঔপনিবেশিক সাহিত্যে মৌসুমী খাদ্যাভাব কিংবা শস্যহানিজনিত ক্ষুধা অর্থাৎ 'মঙ্গা' পরিস্থিতিকে 'scarcity' হিসেবে দেখানো হয়েছে। আর আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় ব্যবহারিক অর্থে 'মঙ্গা' হচ্ছে 'সস্ড়া'র বিপরীত। অর্থাৎ দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি। কোনো মৌসুমে বা কোনো এক সাপ্তাহিক হাটে যদি কোনো দ্রব্যের মূল্য স্বাভাবিকের চেয়ে বৃদ্ধি পায় তা বোঝানোর জন্য গ্রামাঞ্চলের মানুষ সাধারণত 'মঙ্গা' শব্দের ব্যবহার করে থাকেন। অর্থাৎ বাজারে পেঁয়াজের দাম যদি বেড়ে যায় তাহলে বলা হয়, 'পেঁয়াজ মঙ্গা' বা 'পেঁয়াজের বাজার মঙ্গা'। আবার মৌসুম বিশেষে যদি নিত্য প্রয়োজনীয় সবকিছুরই মূল্য সাময়িকভাবে বৃদ্ধি পায় তখন সাধারণভাবে বলা হয় 'বাজার মঙ্গা'। অর্থাৎ সাময়িকভাবে কোনো অঞ্চলে খাদ্যদ্রব্যসহ অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য বেড়ে যাওয়াকে মঙ্গা বলা হয়। এই অর্থে উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সারাদেশেই মঙ্গা একটি স্থায়ী রূপ নিয়েছে এবং মঙ্গার মাত্রা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আলম (২০০৫) বলেন, "মঙ্গা শব্দটি মাঙ্গা বা মাগন শব্দের সমার্থক। অনেক গরিব মানুষ তখন মেগে খায়। এ সময় বাজারে খাদ্যদ্রব্যের অভাব থাকে। দাম থাকে খুবই চড়া। এ সময়টা 'আকাল' বলেই পরিচিত। যেমন অনেকে বলেন, 'কার্তিক মাসি আকাল'।" আহমেদ (২০০৫) বলেন, "মন্দা থেকে 'মঙ্গা' হয়েছে। অর্থাৎ কাজ নেই, তাই সাধারণ জনগণ অভাবে আছে, ক্ষেত্রবিশেষে উপবাসেও আছে।" কিন্তু মঙ্গা শব্দটি 'মাগা' বা 'মেগে খাওয়া'র সমার্থক বলে মনে হয় না। আবার মন্দা অর্থ অবনতি বা হ্রাস; বিশেষ করে দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য বা ক্রয়-বিক্রয়ে হ্রাস। অর্থাৎ বাজারভিত্তিক অর্থের দিক থেকে মঙ্গা হলো মন্দার বিপরীত। সুতরাং মন্দা থেকে মঙ্গা শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে হয় না। তবে 'শ্রমের চাহিদা/বাজার মন্দা' অর্থে মন্দা থেকে 'মঙ্গা'র উৎপত্তি যথার্থ হতে পারে। অনেকে আবার

[১] আমি তখন বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)-এ ড. বিনায়ক সেন-এর অধীনে মাঠ পর্যায়ে গবেষণা কাজে নিয়োজিত ছিলাম।

[২] তথ্য সংগ্রহের কাজে আন্ড়রিকভাবে সহযোগিতা করেছেন তামান্না ইসলাম।

মনে করেন যে মন্বন্ড়র থেকে মঙ্গা শব্দের উৎপত্তি। প্রকৃত অর্থে মঙ্গা শব্দটি মাঙ্গা শব্দের সমার্থক যার অর্থ দুর্মূল্য বা মহার্ঘ। উর্দু শব্দ মেহাঙ্গা অর্থ দামী। সুতরাং মেহেঙ্গা থেকে মাঙ্গা বা মঙ্গা শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলে ধারণা করা যায়। কারণ বিহারের ভাষার সাথে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে ব্যবহৃত অনেক শব্দের মিল আছে। এই অঞ্চলের মানুষ কোনো দামী বা মূল্যবান জিনিস বোঝাতে মঙ্গা শব্দটি ব্যবহার করে। অর্থাৎ মঙ্গা শব্দটি একইসাথে দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান অর্থে ব্যবহৃত হয়। এদিক থেকে মঙ্গা বলতে খাদ্যদ্রব্যসহ অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধিকে বোঝায়।

৩। 'মঙ্গা' কি আসলেই মঙ্গা?

মঙ্গা শব্দটির পরম্পরাগত ব্যবহারিক অর্থের বিষয়টি মাথায় রাখলে উত্তরবঙ্গের অঞ্চল বিশেষের যে অভাব বা ক্ষুধা (hunger/starvation) পরিস্থিতিকে বোঝানোর জন্য মঙ্গা শব্দটি ব্যবহার করা হয় তা সঠিক বলে মনে হয় না। এর পেছনে যুক্তিস্বরূপ বলা যেতে পারে, সাম্প্রতিক সময়ের 'মঙ্গা' পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে, 'মঙ্গাক্রান্ড়' অঞ্চলে খাদ্যদ্রব্যসহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বেশি নয় এবং বছরের অন্যান্য সময়ের তুলনায়ও দ্রব্যমূল্য তেমন মাত্রায় বাড়েনি যে খাদ্যদ্রব্য মঙ্গা হওয়ার কারণে ক্ষুধা পরিস্ড়িতির সৃষ্টি হবে। মঙ্গাকালীন সময়ে 'মঙ্গাক্রান্ড়' অঞ্চলের হাটবাজারগুলোতে খাদ্যদ্রব্যসহ অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীর যোগান স্বাভাবিক দেখা গেছে এবং দ্রব্যসামগ্রীর বাজারদরও দেশের সার্বিক বাজারদরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়েছে। সেখানে কর্মক্ষম মানুষের মাঝে (যাদের ক্রয়ক্ষমতা আছে) কোনো ক্ষুধা পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হয়নি। ক্ষুধাপীড়িত মনে হয়েছে শুধুমাত্র সেইসব মানুষকে, যাদের ক্রয়ক্ষমতা নেই। সুতরাং 'মঙ্গা' বলতে যে পরিস্থিতিকে বোঝানো হয় তাকে এক শ্রেণির মানুষের 'মৌসুমী ক্ষুধা' (seasonal hunger) হিসেবে ধরে নেয়া যায়, যার কারণ খাদ্যের অভাবজনিত নয় বরং কর্মের অভাবজনিত। কোনো মানুষের ক্রয়ক্ষমতা যখন শূন্যের কোটায় নেমে যায় তখন খাদ্যের মূল্য যত কমই হোক, তার জন্য ক্ষুধা অনিবার্য। 'মঙ্গাক্রান্ড়' সেইসব মানুষের বেশিরভাগের পরিচয় - তারা নদীভাঙ্গনের শিকার, বাস্তুহারা ভূমিহীন মানুষ। একসময় তাদের সবই ছিল, এখন তারা নি:স্ব। তারা আশ্রয় নিয়েছে অন্যের অব্যবহৃত জায়গায় বা সরকারি জায়গায়, বাঁধের পাশে বা রাস্ড়ার পাশে। তাদের আর কোনো হাল-গৃহস্থালি নেই, নেই কোনো চাষের জমি। তাদেরকে 'হাতের উপর'◦ চলতে হয়। তাই 'হাত' বন্ধ থাকলে তাদের 'পাত' (খাওয়া) বন্ধ থাকে। এই মানুষগুলো কৃষিকাজ ছাড়া অন্য কোনো কাজ পারেও না, অন্য কোনো কাজের সুযোগও সেখানে নেই। তাই যদিও অভাব তাদের নিত্যদিনের সঙ্গী তবু বছরের অন্যান্য সময়গুলোতে যখন কৃষি কাজের সুযোগ থাকে তখন তারা ক্ষুধায় পতিত হয় না। ক্ষুধায় পতিত হয় সাধারণত আশ্বিন-কার্তিক মাসে, যখন কোনো কৃষিকাজ থাকে না।

বাজারে পর্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য থাকলেও ক্রয়ক্ষমতার অভাবে তারা কিনতে পারে না। তাই অনেক সময় উপোস দিতে হয় অথবা নানা অখাদ্য খেয়ে জীবন চালাতে হয়। ফলে মানুষের মাঝে কলেরা, ডায়রিয়াসহ নানাবিধ রোগ ছড়িয়ে পড়ে। রোগবালাইয়ের প্রবণতা অনেক বেড়ে যায় এবং কখনো কখনো তা মৃত্যু পর্যন্ড় ডেকে আনে। তাই এটি একটি দু:সময়। নাজনীন আরা নূরী (নীলফামারী জেলার ডিমলার একজন স্কুল শিক্ষিকা) 'মঙ্গা' পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেন, 'এটি আকাল'। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায়ও আকাল-এর ব্যবহারিক অর্থে এমন পরিস্থিতিকেই বোঝায়। আকাল হলো অকাল-এর

◦ যাদেরকে প্রতিদিন খাওয়ার জন্য প্রতিদিন রোজগার করতে হয়; যাদের কোনো সঞ্চয় নেই; প্রতিদিনই তারা 'হাত' বা কাজের উপর নির্ভরশীল।

সমার্থক যা দু:সময়, দুর্ভিক্ষ বা অভাব অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং 'মঙ্গা'কে মঙ্গা না বলে আকাল বা 'প্রান্তিক চাষী এবং কৃষিশ্রমিকের আকাল' কিংবা 'কৃষিশ্রমজীবী মানুষের ক্ষুধা' বলা যেতে পারে। উলেণ্ঢখ্য, যেসব ঔপনিবেশিক এবং অ-ঔপনিবেশিক উৎস হতে বৃটিশ আমলের ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে জানা যায় সেসবের কোথাও ক্ষুধা বা দুর্ভিক্ষ বোঝাতে মঙ্গা শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। সুতরাং এই পরিস্থিতিকে 'মঙ্গা' বলাটা সঠিক বলে মনে হয় না।

৪। বাংলার দুর্ভিক্ষ প্রবণতা : ঔপনিবেশিক দায়-দায়িত্ব

পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষের ইতিহাস অনেক পুরনো। পৃথিবীর প্রায় সব অঞ্চলে এবং সব সভ্যতায়ই বিভিন্ন সময়ে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। মৌসুমীবায়ু নির্ভর কৃষিব্যবস্থার কারণে বাংলা অঞ্চলে ফসলহানির ঝুঁকি বরাবরই বেশি ছিল যা দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ। ঐতিহাসিক আকরসমূহ পরীক্ষা করলে প্রাক-বৃটিশ যুগে অন্ড়ত তিনটি দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলার সবচেয়ে প্রাচীনতম লিপি মহাস্থানলিপিতে, যা সম্ভবত ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রচিত হয়েছিল, দুর্ভিক্ষে ত্রাণ ব্যবস্থার কথা উলেণ্ঢখ আছে। আনুমানিক নবম শতকে রচিত *মঞ্জুশ্রী মূলকল্প* গ্রন্থে গৌড়ের পূর্বাঞ্চলের প্রদেশসমূহে 'মহাদুর্ভিক্ষ'র কথা উলেণ্ঢখ আছে। অবশ্য নীহাররঞ্জন রায় মনে করেন যে, দুর্ভিক্ষটি শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বিরাজমান অরাজকতার সময় দেখা দেয়। আবার অনেকে মনে করেন যে, দুর্ভিক্ষটি হয়েছিল আনুমানিক চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্ত শাসনের প্রথম পর্বে। তৃতীয় দুর্ভিক্ষের কথা উলেণ্ঢখ আছে *ফতিয়া ইবরিয়া* নামক গ্রন্থে যার সময়কাল ১৬৬১-১৬৬৩ বর্ণিত হয়েছে। প্রথমোক্ত দুর্ভিক্ষটি ছিল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে আর তৃতীয়টি মনুষ্যসৃষ্ট বলে বর্ণিত আছে। তালিশ লিখেছেন 'র"টির চেয়ে জীবনের দাম ছিল সস্ড়া আর র"টি পাওয়াই যাচ্ছিল না' (উদ্বৃত, খান: ১৯৯৩)। দুই হাজার বছরের ইতিহাসে মাত্র তিনটি দুর্ভিক্ষের উলেণ্ঢখ অবশ্য একটি স্থিতিশীল অর্থনীতিকেই নির্দেশ করে যেখানে কদাচিৎ দুর্ভিক্ষ হতো। অথবা বাংলার ইতিহাসের উপাদানের অভাব এবং প্রাপ্ত উপাদানের বস্তুনিষ্ঠতা সংক্রান্ড় সমস্যার কারনেই হয়তো দুর্ভিক্ষের প্রকৃত হিসাব আমাদের হাতে নেই।

তবে বৃটিশদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ড় নদীমাতৃক গঙ্গাবিধৌত এই ব-দ্বীপ বা বঙ্গ 'ভারতের শস্যভা"ার' হিসেবে খ্যাত ছিল। কিন্তু ১৭৬৫ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা অঞ্চলের দেওয়ানী লাভের পর থেকে পরিস্থিতি পাল্টে যেতে থাকে। প্রায় দুই'শ বছরের বৃটিশ শাসন-শোষণের ফলে ভারতবর্ষের প্রাক্-শিল্প বিপণ্ঢব সমাজের কৃষকের মের"দ" ভেঙ্গে পড়ে। কৃষক এবং কৃষকের জমিকে কেন্দ্র করেই ব্রিটিশ শাসন-শোষণ আবর্তিত হয়েছে। আর তাই তারা ভূমি ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিরামহীন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে যার কোনো সুফল এই অঞ্চলের কৃষক পায়নি, পেয়েছে কুফল। "Under the operation of the various tenancy legislations the peasant society was differentiated as much as that a large section of the peasants became landless and reduced to extreme marginality, and through the massive concentration of land ownership to the upper stratum, the tenants of Bengal (agricultural productive entrepreneur) were paralyzed"[৯] বৃটিশ শাসনের ফলে ভূমি বণ্টন ব্যবস্থায় যে সীমাহীন বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছিল তাতে কৃষক দিনে দিনে ভূমিহীন হতে থাকে।

---

[৯] বিস্ড়ারিত, Rabbani, M. G. (2006), "Shifting Trends in Twentieth Century Politico-Economic Culture in South Asia," Presented at the 19th IAHA Conferenc, Manila, The Philippines, 21-25 November, 2006।

কোম্পানি শাসনের মাত্র ৫ বছরের মাথায় ১৭৭০ সালে বাংলা অঞ্চল ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের শিকার হয়। পূর্ববর্তীকালের দুর্ভিক্ষগুলোর সাথে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্ড়র' নামে খ্যাত ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষের চরিত্রগত কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়। পূর্ববর্তী দুর্ভিক্ষগুলোর কারণ ছিল প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও শস্যহানি। অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ রমেশ দত্ত এবং আধুনিককালের নবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনসহ অনেকের মতে এই দুর্ভিক্ষের পিছনে প্রাকৃতিক কারণের (অনাবৃষ্টি) পাশাপাশি বৃটিশ সরকারের বৃটেনের অনুকূলে গৃহিত বণিকবাদী অর্থনীতি অনেক বেশি দায়ী ছিল। এ বিষয়ে এখানে বিশদ আলোচনা করার সুযোগ নেই। আনুমানিকভাবে বাংলার প্রায় দশ মিলিয়ন (মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ) মানুষ এই দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারায়। বৃটিশ শাসনামলে বাংলাসহ সমগ্র ভারতবর্ষ দুর্ভিক্ষপ্রবণ হয়ে ওঠে যার জন্য দায়ী বৃটিশ কোম্পানি এবং পরবর্তীতে বৃটিশ সরকারের শোষণ। ১৮৭৭-৭৯ সালের দুর্ভিক্ষের সময়ে দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষের ত্রাণের দাবীর উত্তরে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড লিটন যা বলেছিলেন তা থেকেই দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ড় বৃটিশ সরকারের দায়দায়িত্ব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তিনি বলেন, "Let the British public foot the bill for its 'cheap sentiment', if it wished to save life at a cost that would bankrupt India" (Davis, 2000)। তিনি তার প্রশাসনকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, খাদ্যের মূল্য কমানোর ব্যাপারে সরকারের কোনো হস্ড়ক্ষেপের প্রয়োজন নেই। তিনি জেলা কর্মকর্তাদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেন- "Discourage relief works in every possible way...Mere distress is not a sufficient reason for opening a relief work" (Davis 2000)। অথচ ১৭৭০ থেকে ১৭৮৮ সাল পর্যন্ড় সংঘটিত দুর্ভিক্ষসমূহের ফলাফল সম্পর্কে টানা তিন বছর অত্যন্ড় সতর্কতার সাথে তদন্ড় করে লর্ড কর্ণওয়ালিস কোম্পানির শাসনাধীন বাংলার এক-তৃতীয়াংশ অঞ্চলকে জঙ্গল হিসেবে ঘোষণা করেন এবং দেখান যে দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যুর কারণে সেসময় এসব অঞ্চলে কোনো মানুষ ছিল না, ছিল শুধু বন্য পোকা-মাকড় (বিস্ড়ারিত দেখুন Chawla 2005)। এই সময়ে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি এত মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল যে স্থানীয় ভূস্বামীসহ সমাজের বিভিন্ন স্ড়রের সামর্থবান মানুষরা ব্যক্তি উদ্যোগে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এবং বিভিন্ন উপায়ে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলেন যার প্রমাণ পাওয়া যায় ম্যাক্ডোনেল এর *Food Grain Supply as Famine Relief in Bihar and Bengal* গ্রন্থে। তিনি বলেন, "I feel bound, thus to record the manner in which the landed proprietors and wealthy classes of Rangpur treated their tenantry in their hour of need, because in another portion of this section I have suggested that their ordinary dealings with them are regulated by strict business principles" (উদ্ধৃত BDG, Rangpur 1977:27)। সুতরাং দেখা যায় যে, ব্রিটিশ সরকারের শোষণনীতি একদিকে এই অঞ্চলকে দুর্ভিক্ষের মুখে ঠেলে দিয়েছে, অন্যদিকে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের প্রতি তাদের কোনো সহানুভূতি ছিল না।

৫। 'মঙ্গা'র ঐতিহাসিক পটভূমি

'মঙ্গা' বলতে 'উন্নয়ন' জ্ঞানকাে যা বোঝানো হয় তা বছরের একটি বিশেষ সময় বা মৌসুমের একটি স্থানিক সমস্যা। তাই 'মঙ্গা'র ঐতিহাসিকতা খুঁজতে গিয়ে মূলত অতীতের দুর্ভিক্ষগুলোতে বর্তমান মঙ্গাপ্রবণ অঞ্চলসমূহকে খোঁজা হয়েছে এবং চরিত্রগত দিক থেকে অতীতের দুর্ভিক্ষ এবং বর্তমান 'মঙ্গা'র আন্ড়:সম্পর্ক খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে।

হ্যামিলটন-বুকানন (১৯২১) ও ভাসের (১৯১১) বিবরণীতে দেখা যায় যে, ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে বৃহত্তর রংপুর জেলার ৭৬% ভাগ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল থাকলেও বিশ শতকের শুর"তেই এ নির্ভরশীলতার পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৮৫% ভাগে। জেলার স্বল্প সংখ্যক মানুষ অকৃষি কাজের সাথে জড়িত ছিল। কারণ বৃটিশ আমলে কোনো শিল্প-কারখানা গড়ে না ওঠায় এবং প্রাক্-বৃটিশ যুগের কুটির শিল্পসমূহ ধ্বংস হওয়ায় এই অঞ্চলে কৃষি ভিন্ন অন্য কোনো কাজের সুযোগ ছিল না। অপরপক্ষে বৃটিশ শাসন ও শোষণের ফলে সারা বাংলার মতো এই অঞ্চলের কৃষক ও কৃষিও মারাত্মকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ফলে ঊনিশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ড় রপ্তানির জন্য এই জেলা থেকে চাল সংগ্রহ করা হলেও অচিরেই এই অঞ্চল একটি খাদ্য ঘাটতি এলাকায় পরিণত হয়। ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে যেখানে রংপুর থেকে ১.৮ মিলিয়ন মনেরও বেশি চাল রপ্তানির বিবরণ পাওয়া যায়, সেখানে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে রংপুরের ডেপুটি কালেক্টর এই জেলাকে একটি চাল আমদানিকারক অঞ্চল হিসেবে উলেণ্টখ করেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের দুর্ভিক্ষকালীন সময়ে রংপুর থেকে খাদ্য সরবরাহের অনেক তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। অথচ অল্প সময়ের মধ্যেই এই জেলায় খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়। বৃটিশ শাসনের ১৮২ বছরে এই অঞ্চলে প্রায় ৩০/৪০টি দুর্ভিক্ষ হয় (এই সংখ্যা কম বেশি হয় গবেষকদের দুর্ভিক্ষ বিষয়ক ধারণার তারতম্যের কারণে)। আর এইসব দুর্ভিক্ষে প্রাণহানীর সঠিক কোনো হিসাব পাওয়া যায় না। কারণ দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ড় তথ্য যে সব উৎস থেকে পাওয়া যায় তার সবই পুরোদস্ড়র ঔপনিবেশিক।

ভৌগোলিক অখ"তা, অভিন্ন আবহাওয়া, জলবায়ু, নদনদী এবং কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির কারণে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা অঞ্চলের সকল দুর্ভিক্ষেই বর্তমান রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চল আক্রান্ড় হতো। 'ছিয়াত্তরের মন্বন্ড়র' নামে খ্যাত ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষ বর্তমান বাংলাদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা এবং ঝাড়খন্দ অঞ্চলে বিস্ড়ার লাভ করেছিল। এই দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত হয়েছিল তৎকালীন বৃটিশ শাসিত বঙ্গ বা বর্তমান বাংলাদেশে এবং এই অঞ্চল ছিল সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ড় অঞ্চলগুলোর মধ্যে একটি। 'ছিয়াত্তরের মন্বন্ড়র' এর প্রভাব রংপুরেও দেখা যায়। ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দের অনাবৃষ্টির কারণে এই জেলার উৎপাদন মারাত্নকভাবে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। ব্যাপক খাদ্য ঘাটতির কারণে সর্বত্র চালের মূল্য বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কোম্পানি প্রশাসন এই জেলার দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের সাহায্যার্থে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। পক্ষান্ড়রে দুর্ভিক্ষকালীন সময়ে কর আদায়ে কোম্পানি এমন নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেয় যে, দর্ভিক্ষের কবল থেকে মুক্তির লক্ষ্যে এলাকা থেকে পালিয়ে যাওয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের কর উক্ত এলাকার বাসিন্দাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় যা 'না যাই পলাতক কর' নামে আখ্যায়িত হয়েছিল (রূমী, ২০০০)।

১৮৭৩-৭৪ সালের দুর্ভিক্ষে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ড় জেলাগুলোর মধ্যে বৃহত্তর রংপুরও ছিল। দীর্ঘ খরা, প্রাথমিক অবস্থায় দুর্যোগ প্রতিরোধের জন্য তথ্য সংগ্রহে ব্যর্থতা, সরকারি মজুতনীতি ও অপরিমিত রপ্তানি নীতির কারণে এই দুর্ভিক্ষ হয়েছিল (Rahman 1988)। ম্যাক্ডোনেল বলেন, "In the year 1873 the rainfall was not only greatly deficient, it was very unseasonably distributed" (উদ্ধৃত, BDG, Rangpur 1977:26)। অনাবৃষ্টির কারণে ১৮৭৪ সালের শীত মৌসুমে ফসলের ৮০ শতাংশ নষ্ট হয়ে যায় এবং ফলস্বরূপ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তৎকালীন রংপুর জেলার কালেক্টর-এর রিপোর্ট অনুযায়ী এই অনাবৃষ্টির কারণে গাইবান্ধা মহকুমা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ড় হয়েছিল এবং এই এলাকার মাত্র ১/৬ ভাগ ফসল রক্ষা পেয়েছিল। এই দুর্ভিক্ষের সময়ের সরকারি ও বেসরকারি ত্রাণ কার্যক্রম সম্পর্কে ম্যাক্ডোনেল বলেন, "The high prices which so early as January prevailed in this district

pressed with great severity on the poorer classes of the people and from the commencement of the year the local authorities were under the necessity of concerting measures of relief. In no other district, however, in which the failure had been equally pronounced did relief measure cost government so little as in Rangpur; in no other district equally distressed did the people owe so little to government and so much to private charity" (উদ্ধৃত BDG, Rangpur 1977:27)।

১৭৮৭-৮৮ সালের দুর্ভিক্ষে রংপুর অঞ্চল মারাত্মকভাবে আক্রান্ড় হয়েছিল। ঔপনিবেশিক তথ্যসূত্রমতে, এই দুর্ভিক্ষের মূল কারণ ছিল প্রবল বন্যা। এই বন্যা সম্পর্কে রংপুর জেলার তৎকালীন কালেক্টর Board of Revenue-এর কাছে ১৭৮৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর যে প্রতিবেদন জমা দেন তাতে উলেণ্ঢখ করা হয়: "Multitudes of men, women, children and cattle have perished in the floods; and in many places whole village have been so completely swept away, as not to leave the smallest trace whereby to determine that the ground has been occupied" (উদ্ধৃত BDG, Rangpur 1977:30)।

১৮৯৬-৯৭ সালে বাংলায় আারেকটি দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে বাক্ল্যান্ড (১৯০২: ৯৮৮-৯৮৯) বলেন, "Like all previous famines in Bengal, the famine of 1896-97 was caused by the failure of the monsoon rains of 1896, and was the result of 2 successive bad seasons... the effect of these abnormal meteorological conditions was that the total area cultivated with winter rice was about a million acres less than in the preceding years, and that the outturn of the crop was as bad in Bihar and in parts of Bengal as in 1873, the estimate for the whole province being only $7^1/_2$ annas, or less than half the average crop"। ১৯০৮-০৯ সালে বৃহত্তর রংপুর অঞ্চল পুনরায় 'scarcity'র কবলে পড়ে। তবে এই 'scarcity' জেলার সর্বত্র সমানভাবে অনুভূত হয়নি। কেবলমাত্র জেলার এক ফসলি খিয়ার এলাকায় তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছিল।

১৯৪২-৪৩ সালে বাংলায় আারেকটি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকে বৃটিশ সরকারের দেউলিয়াত্বের ভারে সৃষ্ট এই দুর্ভিক্ষ প্রায় ৩.৫ মিলিয়ন মানুষের প্রাণহানীর কারণ হয়। এই দুর্ভিক্ষকে 'মনুষ্য সৃষ্ট' (man made) বলা হয়। কারণ এই সময় বাংলায় চালের তেমন ঘাটতি ছিল না । সেন (১৯৮১) অত্যন্ড় যুক্তিযুক্তভাবে দেখিয়েছেন যে, খাদ্য ঘাটতি এই দুর্ভিক্ষের মূল কারণ ছিল না। বরং মজুত খাদ্যের উপর সাধারণ মানুষের স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে না পারাই ছিল এর মূল কারণ। এই দুর্ভিক্ষের রেশ ছিল প্রায় পুরো দশক জুড়েই। অনেকের কাছে 'পঞ্চাশের মন্বন্ড়র' নামে খ্যাত এই মহাদুর্ভিক্ষে রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চল তীব্রভাবে আক্রান্ড় হয়েছিল। অন্যান্য দুর্ভিক্ষকালীন সময়ের মতো এসময়ও এই অঞ্চলে ফসল ভালো হয়নি। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ঘাটতি এত বেশি ছিল না যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হবে। যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্রিটিশ সরকার এই অঞ্চল থেকে চাল বাইরে চালান করেছিল (র"মী ২০০০)। বাজার থেকে চাল উধাও হয়েছিল এবং মজুত হয়েছিল সরকার, চোরাকারবারী ও মজুতদারদের হাতে। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের পাশাপাশি তৎকালীন রংপুরের সবকটি মহকুমাই চরম দুর্ভিক্ষে পতিত হয়েছিল। ডোমারের দুর্ভিক্ষকালীন অবস্থা সম্পর্কে কমরেড বলরাম সাহা উলেণ্ঢখ করেন, "একদিকে ইংরেজ সরকারের দায়িত্বহীনতা, অপরদিকে অতি লোভী ঠিকাদার,

মজুতদার, মহাজনদের কারসাজিতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস উধাও; লবণ, কেরোসিন, চাল, ডাল অদৃশ্য। গোপনে অতিরিক্ত দাম দিলে পাওয়া যায়, কিন্তু তা গরীবের আয়ত্তের বাহিরে ....শত শত ক্ষুধার্ত ও পীড়িত মানুষ এসে ভিড় করেছে ডোমার বন্দরে" (মুখোপাধ্যায় ও ঘোষ ১৯৮৫: ৭৪)। কুড়িগ্রামের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় কৃষক সমিতি অপরাপর অন্যান্য সংগঠনের সহযোগিতায় কুড়িগ্রাম সদর, কাঁঠালবাড়ী, রাজহাট, সিংহীমারী, পাঙ্গা, বড়বাড়ী, উলিপুর, দুর্গাপুর, বুড়াবুড়িসহ গাইবান্ধার বিভিন্ন এলাকাতেও রিলিফ কার্যক্রম শুর" করেছিল। সর্বত্র স্থানীয় সাহায্যে লঙ্গরখানা পরিচালিত হয়। এই সময় ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহের জন্য সাংস্কৃতিক স্কোয়াড গঠিত হয়েছিল। ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহে গঠিত সাংস্কৃতিক কমিটির লিখিত একটি গান এই দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতার চিত্র তুলে ধরে:

"জলপাইয়া মুই নারী
রংপুরে মোর বাড়ি
স্বামী বেচাইলে ধনীর ঘরে
ওরে, ক্ষুধায় পাগলা প্রাণ পতিরে
মইলো ধন মোর
খাঁও খাঁও করিয়া ...."
(মুখোপাধ্যায় ও ঘোষ, ১৯৮৫: ৭৪)

এ সময় রংপুর জেলায় ১৯৪৩ সালের মার্চ থেকে ১৯৪৪ সালের জুলাই পর্যন্ড় দুর্ভিক্ষ ও মহামারির কারণে ১,৮১,৭৭৮ জন মানুষ প্রাণ হারায়। এর মধ্যে জনবহুল নীলফামারী মহকুমায় সবচেয়ে বেশি মানুষের মৃত্যু ঘটে। এই মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৪৩,৮০৪ জন যা জেলার মোট জনসংখার ৭.৩২% ভাগ। কুড়িগ্রাম মহকুমায় মৃত্যুর হার ছিল ৫.১৫% ভাগ (BDG, Rangpur 1977)।

৬। 'মঙ্গা'র চরিত্র: 'সবুজ বিপণ্ডব' এর আগে ও পরে

'মঙ্গা'র পটভূমি খুঁজতে গিয়ে দেখা যায়, বৃটিশ শাসনামলে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল বা উত্তরবঙ্গ দুর্ভিক্ষপ্রবণ এলাকাগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল। ঔপনিবেশিক তথ্যসূত্রগুলোতে বৃটিশ শাসনামলের সকল দুর্ভিক্ষের জন্যই দায়ী করা হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ফসলহানিকে। বাক্ল্যন্ড (১৯০২) বলেন, "All known famines in Bengal and Orissa have been rice famine. In Bihar and Northern Bengal the *bhadoi* and *rabi* crops may affect the turning point between famine and no famine, but even there the immediate cause of scarcities and famines has always been the failure of the great winter rice crop" কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ফসলহনি দুর্ভিক্ষের একটি কারণ হলেও সকল দুর্ভিক্ষের পেছনেই মূল ভূমিকা পালন করেছে বৃটিশদের শোষণনীতি। এর প্রমাণ স্বরূপ দেখা যায়, বৃটিশ পরবর্তী গত ছয় দশকে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যুর সংখ্যা বৃটিশ শাসনের দুই'শ বছরে দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যুর এক শতাংশও নয়। অথচ পরিবেশের ভারসাম্যহানীর কারণে বন্যা, অনাবৃষ্টি, নদীভাঙ্গন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ পূর্বের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এর কারণ স্বরূপ অনিল চাওলার (২০০৫) ভাষায় বলা যায়, "Famines have missed the most essential aspect - criminal act of the British Government।" সুতরাং স্বাধীন বাংলাদেশে 'মঙ্গা' বলতে যে আকাল পরিস্থিতিকে বোঝানো হয় তার পেছনে প্রাকৃতিক চলকগুলোই মূল ভূমিকা পালন করে। অবশ্য স্বাধীন দেশে ঔপনিবেশিক শোষণ না থাকলেও আছে সম্পদ ও উন্নয়নের অসম বণ্টন, মঙ্গা সৃষ্টিতে যার অবদান

নেহাত কম নয়। তাই 'মঙ্গা'র চরিত্র বিশেণ্ডষণের ক্ষেত্রে এর প্রাকৃতিক চলকগুলোকে গুর"ত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। আর এই কাজটি ঠিকমত করা হয় না বলেই মঙ্গা শব্দটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাধারণীকরণ সমস্যা চোখে পড়ে। যেমন- 'উত্তরবঙ্গের মঙ্গা' বলে সমগ্র উত্তরঙ্গের উপর সমানভাবে 'মঙ্গা' চাপিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে ভিন্ন ভিন্ন কিছু প্রাকৃতিক চলক আছে যা 'মঙ্গা' প্রপঞ্চকে এক এক জেলার জন্য এক এক রকম করে তুলে।

দিনাজপুর, পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাও জেলা অর্থাৎ বৃহত্তর দিনাজপুর অঞ্চল বাংলাদেশের অন্যতম ধান উৎপাদনকারী অঞ্চল। বৃটিশ কারসাজি ছাড়া শুধুমাত্র প্রাকৃতিক কারণজনিত দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতিতে এই বৃহত্তর দিনাজপুর অঞ্চল কখনোই খুব বেশি আক্রান্ড় হয়নি। 'মঙ্গা'র ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় - এর তীব্রতা বৃহত্তর রংপুর জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। বৃহত্তর রংপুর জেলার মধ্যে ছিল বর্তমান রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী এবং গাইবান্ধা জেলা। বর্তমান সময়েও 'মঙ্গাক্রান্ড় ' এলাকা বলতে এই কয়টি জেলাকেই বোঝানো হয়। সুতরাং 'মঙ্গা'র এই উপ-আঞ্চলিকতাকে বাদ দিয়ে 'মঙ্গা' বিশেণ্ডষণ করা সঠিক হবে না। তাছাড়া বৃহত্তর রংপুর জেলার সাথে দিনাজপুরের ভূ-প্রাকৃতিক এবং অর্থনেতিক কর্মকা"ের পার্থক্য 'মঙ্গা'র কারণ বিশেণ্ডষণে বিভিন্ন চলকের যোগান দিতে পারে। এখানে সাদামাটাভাবে বলা যেতে পারে যে, নদীভাঙ্গন ও বন্যার দ্বারা বৃহত্তর রংপুর বছর বছর ক্ষতিগ্রস্ড় হলেও বৃহত্তর দিনাজপুরে এর সম্ভাবনা নেই। প্রথমত বৃহত্তর দিনাজপুর অঞ্চল উচ্চ ভূমি নিয়ে গঠিত বলে এই অঞ্চল বন্যাপ্রবণ নয়। দ্বিতীয়ত, দিনাজপুরে নদীভাঙ্গন নেই। আর 'মঙ্গা' বলতে যে অভাব বা ক্ষুধা পরিস্থিতিকে বোঝানো হয়, বন্যা ও নদীভাঙ্গন তার প্রধান দু'টি কারণ।

আমরা যদি নদীসমূহের গতিপথের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব ব্রহ্মপুত্র নদী কুড়িগ্রাম দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে গাইবান্ধায় এসে যমুনা নাম ধারণ করেছে। অপর দিকে তিস্ড়া নদী লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে নীলফামারী, রংপুর ও কুড়িগ্রাম হয়ে গাইবান্ধায় এসে ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিলিত হয়েছে। আরও দুইটি বড় নদী - ধরলা ও দুধকুমার ছাড়াও এই অঞ্চলে ছিল অনেক ছোট ছোট নদী। ('ছিল' বলছি এই জন্য যে, এই নদীগুলোর অধিকাংশই এখন মৃতপ্রায়)। নীলফামারী, রংপুর, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা জেলার ব্রহ্মপুত্র ও তিস্ড়া উপকূলবর্তী অঞ্চলটিই মূলত 'মঙ্গা'প্রবণ। প্রতিবছর তিস্ড়া ও ব্রহ্মপুত্র নদীর ভাঙ্গন, ভারতের নদী সন্ত্রাসের কারণে তিস্ড়ার শুকিয়ে যাওয়া, 'তিস্ড়া ব্যারেজের কুফল'[৩], এবং নদীর নাব্যতা হ্রাসজনিত বন্যা প্রবণতা নদী তীরবর্তী বিস্ড়ীর্ণ জনপদকে 'মঙ্গাপ্রবণ' করে তুলেছে বছরের পর বছর ধরে। অনেকেই তিস্ড়ার ভাঙ্গন, 'তিস্ড়া ব্যারেজের কুফল' এবং তিস্ড়ার নাব্যতা হ্রাসজনিত কুপ্রভাবের কারণে তিস্ড়াকে 'রংপুরের দু:খ' হিসেবে আখ্যা দিয়ে থাকেন। 'মঙ্গা'র শ্রেণি ও পেশাভিত্তিক চরিত্র বিশেণ্ডষণের মাধ্যমে পরবর্তীতে এই বিষয়টি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হবে।

'মঙ্গা'র চরিত্র বিশেণ্ডষণে যে বিষয়টিকে গুর"ত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে তা হলো বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে গত কয়েক দশকে ঘটে যাওয়া পরিবর্তন। সেচের মাধ্যমে ইরি (IRRI) ধানের চাষ শুর" হওয়ার পর বা কেতাবী ভাষায় 'সবুজ বিপণ্ডবের' পর বিশেষ করে 'মঙ্গা'প্রবণ এলাকাসহ সারা বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে। বোরো মৌসুমে সেচের মাধ্যমে উৎপাদিত উচ্চ ফলনশীল ব্রি (BRRI) জাতের ধান ব্যাপকভাবে উৎপাদিত হচ্ছে। এর

[৩] স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকেই জানিয়েছেন যে, তিস্ড়া ব্যারেজের নির্মাণ কৌশলের ত্র"টিজনিত কারণে এর এক পাশে বিস্ড়ীর্ণ এলাকা নদীভাঙ্গনের শিকার হয়েছে ক্ষং আরেক পাশে বালি জমে বিস্ড়ীর্ণ ফসলের মাঠ বালুচরে পরিণত হয়েছে।

মাধ্যমে বাংলাদেশের ফসলী মৌসুমের কিছু প্রপঞ্চ পরিবর্তিত হয়েছে যা 'মঙ্গা'র সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। তাই আমি 'মঙ্গা'র চরিত্র বিশেণ্ডষণের সুবিধার্থে 'মঙ্গা'কে 'সবুজ বিপণ্ডব' পূর্ববর্তী এবং 'সবুজ বিপণ্ডব' পরবর্তী এই দুইভাগে বিভক্ত করেছি।

৬.১। 'সবুজ বিপণ্ডব' পূর্ববর্তী 'মঙ্গা'

'সবুজ বিপণ্ডব' পূর্ববর্তী সময়ের উৎপাদিত প্রধান প্রধান ফসল এবং তাদের মৌসুম বিশেণ্ডষণ করলে তৎকালীন সময়ের 'মঙ্গা'র চরিত্র বোঝা যায়। বাংলাদেশে ধান উৎপাদনের ৩টি মৌসুম - আমন, আউশ ও বোরো। 'সবুজ বিপণ্ডব' বা ইরি পূর্ববর্তী সময়ে বর্তমান 'মঙ্গা'প্রবণ এলাকাসহ সারাদেশেই আমন ছিল প্রধান ধান। আমন ধান দুই প্রকার- রোপা আমন ও বোনা আমন। অপেক্ষাকৃত উঁচু জমিতে বোনা আমন এবং নিচু জমিতে রোপা আমনের চাষ হয় বিধায় কোনো জমিই এই চাষ থেকে বাদ পড়ে না। আমন ধানের চাষের সময় আষাঢ়-শ্রাবণ মাস আর শস্য-সংগ্রহের সময় অগ্রহায়ণ মাস। এরপর আসে বোরো মৌসুম। কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে রোপন করে বৈশাখ-জৈষ্ঠ মাসে এ ধান কাটা হয়। এই বোরো মৌসুমের পাশাপাশি চলে রবিশস্যের মৌসুম; অর্থাৎ হেমন্ড়কালে আমন ধান কাটার পর এই শস্যের বীজ বুনা হয় এবং বসন্ড়কালে অর্থাৎ ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে এই ফসল ঘরে আসে। বোরো মৌসুম পরবর্তী সময়ে অপেক্ষাকৃত উঁচু জমিতে এক প্রকার ধান বপন করা হয়। অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যে অর্থাৎ আশু এই ধান ঘরে আসে বিধায় 'আশু' থেকে এই ধানের নাম হয় আউশ।

উৎপাদনের পরিমাণের দিক থেকে বিশেণ্ডষণ করলে দেখা যায়, 'সবুজ বিপণ্ডব' পূর্ববর্তী সময়ে আমন ধানই ছিল বছরের প্রধান খাদ্যশস্য। কৃষকরা সারা বছরের খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য মূলত আমন ধানের উপরই নির্ভর করত। অন্যদিকে বোরো চাষে সেচের দরকার হতো এবং যেহেতু নলকূপের সেচ ব্যবস্থা ছিল না তাই কেবলমাত্র জলাবদ্ধ নিচু জমি বা বিল/হাওড় এলাকায় এ ধানের চাষ হতো বিধায় এই ধানের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল কম। এ মৌসুমে ধানের পাশাপাশি পাট উৎপাদন হতো। রবিশস্যের মধ্যে ছিল গম, আলু, কাউন, বিভিন্ন সবজি ইত্যাদি। আর বর্ষাকালে যে আউশ ধানের উৎপাদন হতো তা ছিল পরিমাণের দিক থেকে কম অর্থাৎ এই ধান কৃষকের বাড়তি চাহিদা মেটালেও এটি নির্ভরযোগ্য ছিল না। সুতরাং আমন ছিল বছরের প্রধান খাদ্যশস্য যার উপর কৃষকরা তাদের পরিবারের সারা বছরের খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য নির্ভর করত। তাই বছর ঘুরে আবার যখন আমন ধান রোপনের মৌসুম আসত তখন স্বভাবতই কৃষকের গোলার ধান ফুরিয়ে যেত। কারণ আগেই বলেছি বোরো এবং আউশ ধানের উৎপাদন হতো অপর্যাপ্ত। সুতরাং এই সময়ে দুটি কারণে কৃষকের ঘরে ঘরে অভাব দেখা দিত: (১) বছর শেষে গোলার ধান ফুরিয়ে যাওয়া, এবং (২) আমন ধান রোপনের পিছনে অনেক বিনিয়োগ করা।

যে বছর অতিরিক্ত বন্যা হতো এবং আমন ধানের বীজতলা নষ্ট হয়ে যেত সে বছর এই অভাব তীব্রতর হতো। তখন আমন ধানের চারার সংকট দেখা দিত যা কৃষকের অর্থনৈতিক জীবনকেও সংকটাপন্ন করে তুলত। কৃষকের অভাব আরও মারাত্মক আকার ধারণ করত যদি কোনো বছর অকাল বন্যায় (ভাদ্র-আশ্বিন মাসের বন্যা) রোপন করা আমন ধান নষ্ট হয়ে যেত। কারণ যেকোনো উপায়ে কৃষককে একই জমিতে দ্বিতীয় বার বা কখনো কখনো তৃতীয় বারের মতো ধানের চারা রোপন করতে হতো। এমনি পরিস্থিতিতে কৃষকরা কখনো পালের গর—-ছাগল বিক্রি করে, কখনো ধারকর্জ করে, কখনোবা ঋণ করে ইত্যাদি নানাবিদ উপায়ে আমন ধান রোপন করত। এবং পরবর্তী আশ্বিন-কার্তিক

দুই মাস তারা চরম অভাবের মধ্যে কাটাত এবং ক্ষেতের ধান পাকার জন্য অগ্রহায়ণ মাসের অপেক্ষায় থাকত। তাই এই সময়টাকে বলা হত 'আকাল'। যে বছরগুলোতে বন্যা ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করত এবং নদীভাঙ্গন বিস্তীর্ণ জনপদ গ্রাস করত, সে বছরগুলোতে এই অভাব সাময়িক ক্ষুধায় রূপ নিত। বৃটিশদের দীর্ঘস্থায়ী শোষণের ফলে যত দিন গড়িয়েছে কৃষকের অবস্থা তত বেশি নাজুক হয়েছে এবং এই মৌসুমের ক্ষুধা ফি বছর দেখা দিয়েছে। এভাবেই আশ্বিন-কার্তিক মাসের এই ক্ষুধা বছর বছর ফিরে এসেছে এবং 'মৌসুমী ক্ষুধা' হিসেবে প্রান্তিক চাষীদের জীবনে স্থায়ী হয়েছে। বছরের অন্যান্য সময় সচ্ছল থাকলেও প্রান্তিক চাষীরা এই সময়ে সাময়িক ক্ষুধার শিকার হতো।

বন্যা দীর্ঘস্থায়ী হলে বন্যা পরবর্তী সময়ে কলেরা, ডায়রিয়া, জ্বর, সর্দি-কাশি ইত্যাদি পানিবাহী ও ছোঁয়াচে রোগের প্রবণতা দেখা দিত। তাছাড়া ক্ষুধার তাড়নায় নানা অখাদ্য খাওয়ার কারণেও এ সময়টাতে তাদের মাঝে ডায়রিয়া ও কলেরার মতো রোগ ছড়িয়ে পড়ত। আর সে সময় (মোটামুটিভাবে দুই/তিন দশক আগ পর্যন্ত) যেহেতু গ্রামের মানুষের স্বাস্থ্য সেবার তেমন কোনো সুযোগ ছিল না এবং ডায়রিয়া ও কলেরা রোগের প্রচলিত ভুল চিকিৎসাই মানুষের মৃত্যু ডেকে আনত, তাই এসব রোগবালাই খুব সহজেই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ত। আশ্বিন-কার্তিক মাসের ক্ষুধা ও রোগ-বালাই কোনো কোনো বছর মহামারি আকার ধারণ করত।

কৃষকের দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে আশ্বিন-কার্তিক মাসের অভাবের প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এর চরিত্রও মারাত্মক আকার ধারণ করতে থাকে। তাই কার্তিক মাস এসময় থেকে বিশেষ করে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে 'মরা কার্তিক' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে ('মরা' বিশেষণ দ্বারা কার্তিক মাসের ক্ষুধা ও রোগ-বালাইয়ের চিত্রটিই বোঝানো হয়)। অবশ্য চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং স্বাস্থ্য সেবার উন্নতির ফলে কোনো মহামারি রোগ এখন আর নেই। বছর বছর একটি নির্দিষ্ট মৌসুমে এই ক্ষুধা দেখা দেয় বলে এক বছরের হিসাবে এর চরিত্র হয়ে পড়ে মৌসুমী। কিন্তু যুগের হিসাবে এটি স্থায়ী। অর্থাৎ আশ্বিন-কার্তিক মাসের এই ক্ষুধা হচ্ছে একটি মৌসুম ভিত্তিক স্থায়ী ক্ষুধা যা ফি বছর দেখা দেয়। উত্তরাঞ্চলের এই ক্ষুধা পরিস্থিতিকেই 'মঙ্গা' বলা হয়। এতক্ষণ ধরে ইরি পূর্ববর্তী 'মঙ্গা'র যে চরিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করলাম তার উপর ভিত্তি করে ইরি পূর্ববর্তী এই 'মঙ্গা'কে মৌসুমী 'মঙ্গা' (ফসলের মৌসুম ভিত্তিক মঙ্গা) বা কৃষকের 'মঙ্গা' হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

৬.২। 'সবুজ বিপ্লব' পরবর্তী 'মঙ্গা'

১৯৭৭ সালে বাংলাদেশে প্রথম সরকারি উদ্যোগে IRRI (International Rice Research Institute) কর্তৃক উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল IR-8 জাতের ধান চাষ শুরু হয়। গভীর এবং অগভীর নলকূপের মাধ্যমে নিয়মিত সেচ দিয়ে বোরো মৌসুমে এই ধানের আবাদ শুরু হয়। উচ্চ ফলনশীল হওয়ায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই ধানের চাষ সারা দেশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমান সময়ে কৃষকরা বোরো মৌসুমে সেচের মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল ব্রি (BRRI) জাতের ধান উৎপাদনের প্রতি বেশি মনোযোগী। সেচ কাজে পাওয়ার-পাম্প এর পর্যাপ্ততার পাশাপাশি পলল্টী বিদ্যুতের ব্যবহার দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে এই ধানের চাষ প্রচলনে সহায়তা করেছে। এই ধান চাষ সম্পর্কিত যে বিষয়টি এখানে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, এই ধান ঘরে ওঠে জৈষ্ঠ্য-আষাঢ় মাসে। অর্থাৎ জৈষ্ঠ্য-আষাঢ় মাসে কৃষক যে ধান উৎপাদন করে তা মাত্র চার মাসের মাথায় আশ্বিন-কার্তিক ('মঙ্গা'কালীণ সময়) মাসেই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা নয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বোরো মৌসুমে অধিক ধান চাষের ফলে আশ্বিন-কার্তিক

মাসের প্রপঞ্চ ইরি-পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে এমনভাবে বদলেছে যে এই সময়টাতে কৃষকের ঘরে ইরি পূর্ববর্তী সময়ের মতো মৌসুমী 'মঙ্গা' থাকার কথা নয়। তবুও এই নির্দিষ্ট সময়ে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের একটি বড় অংশ জুড়ে 'মঙ্গা' বিরাজ করে। তাহলে এই 'মঙ্গা'র চরিত্র কেমন? 'মঙ্গাক্রান্ড়' 'দের আর্থ-সামাজিক ও পেশাগত পরিচয় কী? তারা কেন 'মঙ্গাক্রান্ড়'? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার জন্য 'মঙ্গা'কালীন সময়ে 'মঙ্গাক্রান্ড়' এলাকা পরিদর্শন করে, 'মঙ্গাক্রান্ড়' মানুষের সাথে বিভিন্ন পদ্ধতিতে কথা বলে এবং 'মঙ্গা' সংক্রান্ড় বিভিন্ন ঘটনা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সেসব তথ্যের ভিত্তিতে 'মঙ্গা'র বাস্ড়বতা পরিবেশনের মাধ্যমে নিম্নে সাম্প্রতিক সময়ের 'মঙ্গা'র চরিত্র খোঁজার চেষ্টা করা হলো।

৭। 'মঙ্গা'র বাস্ড়বতা: একটি মাঠ জরিপের ফলাফল

আশ্বিন মাসে 'মঙ্গা' শুর" হয় এবং কার্তিক মাসে তা তীব্র আকার ধারণ করে। কারণ, মঙ্গাকালীন সময়ে অভাবী প্রান্ড়িক চাষী ও কৃষি শ্রমিকদের প্রতিটি দিন কাটে ঋণাত্মক অবস্থার মধ্য দিয়ে। ফলে আশ্বিন মাসে অভাব শুর" হয়ে কার্তিক মাস পর্যন্ড় ক্ষুধার্ত মানুষরা খাদ্য ক্রয়ের তাগিদে হালের গর", ছাগল, হাঁস-মুরগিসহ গৃহস্থালী সামগ্রী পর্যন্ড় বিক্রি করে দেয়। অনেক সময় তাদের ঋণ আর দোকানে বাকির পরিমাণ এত বেড়ে যায় যে তখন তারা চাইলেও আর ধার-কর্জ বা দোকানে বাকিতে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারে না। অর্থাৎ কার্তিক মাসে তাদের ক্রয় ক্ষমতা শূন্যে নেমে আসে। তাই বাজারে পর্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য থাকলেও দরিদ্র কৃষিশ্রমিক ও প্রান্ড়িক চাষীদের মধ্যে ক্ষুধা তীব্র আকার ধারণ করে। একই সময়ে অবশ্য সারা মাঠে চলে ধান পাকার আয়োজন। কিন্তু বিস্ড়ীর্ণ সোনালী ধান ক্ষেতে তাকিয়ে বুক ভরলেও পেট ভরে না নিরন্ন কৃষিশ্রমিকের। তাদেরকে অপেক্ষা করতে হয় অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ড়। অবশ্য ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের এই অপেক্ষার মাঝে নিজের ঘরে সোনালী ফসল তোলার কোনো স্বপ্ন নেই। কারণ তাদের নিজের কোনো জমি নেই। তাই মাঠ ভরা ফসলে তাদের কোনো অংশীদারিত্ব নেই। তারা কেবলই অপেক্ষা করে ধান কাটার কাজ পাওয়ার জন্য। ধান কাটার মৌসুমে প্রতিদিন কাজ পাওয়া যাবে এবং মজুরির টাকায় ছেলেমেয়ে নিয়ে দিনে দু'বেলা খেতে পারবে - এটুকু প্রত্যাশা নিয়েই তারা অপেক্ষায় থাকে।

'মঙ্গা' বা দুর্ভিক্ষের প্রাকৃতিক চলক যেমন - অনাবৃষ্টি, বন্যা, নদীভাঙ্গনের পাশাপাশি ভূমিবণ্টন ব্যবস্থায় চরম বৈষম্য এবং প্রান্ড়িক চাষীদের জীবনের 'দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র' 'মঙ্গা'র পেছনে স্থায়ী চলক হিসেবে কাজ করে। 'মঙ্গা'প্রবণ এলাকা তথা বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য অনেক বেশি। সচ্ছল মধ্যবিত্তের সংখ্যা সেখানে খুবই কম। অধিকাংশ জমির মালিকানা স্বল্পসংখ্যক উচ্চবিত্তের হাতে। প্রান্ড়িক চাষী ও ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকের সংখ্যাই বেশি। আলম বিদিতর ইউনিয়নের পাইকেনের তিস্ড়া পারের (বাঁধ এলাকা) ছলিম উদ্দিন (৬০) বলেন, "বাহে হামার দেশে (অঞ্চলে) যার আছে, তার বহুত আছে, যার নাই, তার কিছুই নাই।" 'মহকুমার জোতদাররা প্রজাস্বত্ব আইন অনুযায়ী জোতদার ছিল না। বেশিরভাগই ছিল বড় রায়ত। তাদের আবাদী জমির পরিমাণ বিঘা দিয়ে হিসাব করা যায় না' (Rahman 1988)। অধিকাংশ ভূমির মালিকানা মুষ্ঠিমেয় মানুষের হাতে। তারা হাজার হাজার মণ ধান বিক্রি করে দেয় শহরের ব্যবসায়ীদের কাছে। অথচ প্রান্ড়িক চাষী ও কৃষি শ্রমিকের খাদ্যাভাব কাটে না সারা বছর। গঙ্গাচড়া থানার নোয়ালী-কচুয়া ইউনিয়নের তিস্ড়ার পারে বসবাসকারি নদী ভাঙ্গনের শিকার সাইদুল ইসলাম (২০) তার বাড়ির পাশের বিস্ড়ীর্ণ ধানক্ষেত দেখিয়ে

বলেন, "এই যে মাঠ ভর্তি ধান দেখতেছেন এর পুরোটাই একজনের। এখানের জমি-জমা সব বড়লোকদের।"

অপরপক্ষে প্রান্তিক চাষীরা ফসল চাষ করার সময় জমিতে চাষ দেয়া, সেচ দেয়া, সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা ইত্যাদি কাজে যে টাকার সমস্যায় পড়ে, তা মিটাতে গিয়ে চড়া সুদে টাকা ধার নেয়। সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে মৌসুম ভিত্তিক স্বল্পকালীন কৃষিঋণের ব্যবস্থা না থাকায় কৃষকরা কুসীদজীবীদের নিকট থেকে চড়া সুদে ঋণ গ্রহণ করে। আবার ফসল ঘরে উঠার সাথে সাথেই ঋণদাতারা সুদে-আসলে ঋণ পরিশোধের জন্য চাপ দেয়। তখন কৃষকরা নিজেদের প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্য মজুদ না করেই উৎপাদিত খাদ্যশস্য কম মূল্যে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। আর এই সুযোগেই প্রান্তিক চাষীদের শোষণ করে মধ্যস্বত্বভোগীরা। সরকারিভাবে কৃষিপণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণের অভাবে প্রান্তিক চাষীরা অনেক সময় উৎপাদন খরচের চেয়ে কম মূল্যে তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য দালাল, ফড়িয়া নামের মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। এসব কারণেই তাদের সংসারে সারা বছর ধরে চলে টানাপোড়ন।

উত্তরাঞ্চলের 'মঙ্গা' কবলিত এলাকাগুলোর মধ্যে রংপুর জেলা অন্যতম। এই জেলার তিস্তার ভাঙ্গন কবলিত গঙ্গাচড়া থানায় 'মঙ্গা'র প্রভাব অনেক বেশি, যা দুর্ভিক্ষের পর্যায়ে পড়ে। অথচ রংপুর শহরের বিভিন্ন বাজার এবং অন্যান্য স্থানীয় বাজারে গিয়ে দেখা গেল সব কিছুই স্বাভাবিক মূল্যে বিক্রি হচ্ছে। ঢাকাসহ সারা দেশের বাজার দরের সাথে তীব্রভাবে 'মঙ্গা' কবলিত গঙ্গাচড়ার বাজার দরেরও উলেণ্ঢখযোগ্য কোনো তারতম্য লক্ষ করা যায়নি। অর্থাৎ বহুল আলোচিত 'মঙ্গা'র কোনো প্রভাব 'মঙ্গা' কবলিত এলাকার বাজারগুলোতে নেই। তবে জেলা শহর এবং থানা সদরগুলোতে রিক্সার সংখ্যা দেখে মানুষের কর্মহীনতার বিষয়টা সহজেই অনুমান করা গেল। কয়েকজন রিক্সাওয়ালার সাথে কথা বলে জানা গেল, তাদের কারো বাড়ি শহরের পার্শ্ববর্তী গ্রামে, কারো বাড়ি দূরবর্তী চর বা নদীভাঙ্গন এলাকায়। তারা জানালেন, অন্যান্য সময়ের তুলনায় এখন শহরে রিক্সার সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি। গ্রামাঞ্চলে মানুষের হাতে কোনো কাজ নেই বলে অনেকেই শহরে এসে সাময়িকভাবে এই পেশায় নেমেছে। তাদের কেউ কেউ এই পেশায় একেবারেই নতুন। অনেকে আবার প্রতি বছর নিয়ম করেই এই মৌসুমে শহরে এসে রিক্সা চালায়। একই চিত্র পাওয়া যায় রংপুর, কুড়িগ্রাম ও নীলফামারীর প্রত্যেকটি জেলা ও থানা শহরে।

রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া থানা 'মঙ্গা' কবলিত এলাকাগুলোর মধ্যে অন্যতম। এই থানার সদর ইউনিয়ন, বড়বিল, নোয়ালী-কচুয়া, আলম বিদিতর, বেতগাড়ি ও কোলকোন্দ ইউনিয়নে তীব্র 'মঙ্গা' পরিস্থিতি লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে আলম বিদিতর, বড়বিল, কোলকোন্দ ও নোয়ালী-কচুয়া ইউনিয়নের তিস্তার পারে অস্থায়ীভাবে বসবাসকারী নদীভাঙ্গনের শিকার অজস্র মানুষের মধ্যে দুর্ভিক্ষের চিত্রই পাওয়া যায়। বাঁধের দুই পাশের অসমতল, অপ্রশস্ত জায়গা জুড়ে ঝোঁপড়ি বেঁধে, চালা করে বাস করছে অসংখ্য মানুষ। কদাচিৎ দুই-একটি টিনের ঘরও দেখা যায়। নদীর গ্রাস থেকে শুধু ঐ ঘরটাই হয়তো রক্ষা করতে পেরেছে। ঘরটা দেখে সচ্ছল মনে হলেও ভিতরের খোঁজ নিলে জানা যায়, অনেক দিন তারা পেটপুরে মাছ-ভাত খেতে পায় না। দুই বেলা বা এক বেলা, 'আধা পেটা' বা 'সিকি পেটা' খেয়েই চলে তাদের প্রায় দিন। অনেক সময় আবার তাও জোটেনা। অনেকে অনেক সময় দুদিনেও

কোনো অন্ন জুটাতে পারে না। ঘনবসতিপূর্ণ বাঁধ ধরে হাঁটার সময় পিছু নেয়া উৎসুক নিরন্ন শিশু-কিশোরদের দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছে যেন ক্ষুধার্ত মানুষের নিরব মিছিল। তাদের সারা গায়ে ক্ষুধা আর দারিদ্র্যের চিহ্ন। পুরো বাঁধ এলাকায় শিশু-কিশোর, নারী আর বৃদ্ধ লোকদের মুখের দিকে তাকিয়ে ওটাকে দুর্ভিক্ষের জনপদই মনে হয়েছে। ছলিম উদ্দিন (৬০) তাঁর অবস্থার বর্ণনা দেন এভাবে,

> হামার ছেলে প্রায় ১৫/২০ দিন আগে ঢাকায় গেছে রিক্সা চালাইতে। যাওয়ার সময় একজনের থেকে ২০০ টেকা সুদের উপর নিয়ে ১০০ টেকা হামারে দিয়ে গেছে, আর ১০০ টেকা ভাড়া নিয়ে গেছে। যাবার সময় আরেক জনরে বলে গেছে হামার চলার জন্যে সুদের উপর কিছু টেকা দেওয়ার জন্যে। যদ্দিন না আইব, আমি এর/ওর কাছ থেকে সুদের উপর কিছু টেকা নিয়ে কষ্ট করি চলিমু। ছেলে ফিরে আইলে শোধ দিবে।

আলম বিদিতর ইউনিয়নের পাইকেনের কান্দু নামের প্রায় ৭০ বছর বয়সী এক বৃদ্ধ তাঁর ক্ষুধার বর্ণনা দেন এভাবে,

> জমিজমা সব নদী খাইছে। হাতের উপর চলি। এখনতো হাতও না চলে। এখন কি করে বাঁচি, বাবা! কত যে উপোস থাকি! উপোসের কোনো হিসেব নাই! ... ঘরত খাবার নাই। আজ যে কি খামু সেই চিন্ড়ায় তো বাঁচি না! ঘরত চাল নাই বইলে রোযা করতে পারি না। দুইদিন ধরে ঠিকমত খাই না! সরকারের কোনো সাহায্য নাই পাই। সামনে ধান কাটা শুর্ হইলে মান্ষে কাম পাইব। হামি তো কামও পামু না। হামি ধান কাটতে পারলেও ধান উবাতে (বহন করা) পারি না। হামার কাটা ধানতো অন্য কেউ উবায়ে দিব না! (যে শ্রমিক ধান কাটে তাকেই সেই ধান কৃষকের বাড়িতে পৌঁছে দিতে হয়) তাই ধান কাটার সময়ও হামার হাত চলব না! এইবার মনে হয় না খায়েই মরতে হইব (কান্না)!

নজিরন নামের এক অশীতিপর শীর্ণকায় বৃদ্ধা রাস্ড়ায় বসে প্রলাপ বকছিলেন। কাছে গিয়ে বুঝলাম তার শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। জানালেন সারাদিন কিছু খাননি। তার চোখে মুখে ক্ষুধার স্পষ্ট ছাপ। তিনি বলেন,

> হামার কোনো বেটা নাই! পোষাইয়ে মানুষ নাই! ভাত নাই মিলে! মঙ্গা! ভাত মিলে না! তরকারী মিলে না! সরকার কিচ্ছু নাই দেয়। এক পয়সাও নাই দেয়। মেম্বরকে কইলু - হামার খাওয়াইয়ে নাই, পোষাইয়ে নাই, মোরে খাবার দেন। নাই দেয়!

একই গ্রামের খাদিজা নামক আরেক বৃদ্ধা খেতে না পেয়ে মারা গেছে (এই মাঠ জরিপের কয়েকদিন আগে)। তার ছেলের বউ এবং পাড়া-প্রতিবেশিদের সাথে কথা বলে জানা যায় এই 'মঙ্গা'র মৌসুমে দিনের পর দিন সে না খেয়ে থেকেছে। আগে সে দূরের গ্রামে গিয়ে ভিক্ষা করত। কিন্তু এবার সে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল বলে দূরে ভিক্ষা করতে যেতে পারেনি। তাই খেতে না পেয়েই অবশেষে সে মারা যায়। তার ছেলেরা তখন কেউ বাড়িতে ছিল না।

গঙ্গাচড়া থানার বড়বিল ইউনিয়নেও 'মঙ্গা'র করুণ চিত্র চোখে পড়ল। এই ইউনিয়নের রাজপুর গ্রামের আঃ সাত্তার (৫৫) বলেন, "তিনদিন ধরে ভাত খাই না! গতকাল কিচ্ছু খাই নাই! দুই মাস ধইরে কাম বন্ধ। হাতও চলে না, খাওনও পাই না!" তিনি আরও বলেন, "অভাব মাইনে, যার অভাব তার। যার জমিজমা আছে, হাল-গেরস্থি আছে, তার অভাব নাই।" তিনি যথার্থই বলেছেন। 'মঙ্গা' বলতে যা বোঝানো হয়, সেই ক্ষুধার চিত্র পাওয়া যায় কেবল নদী ভাঙ্গনের শিকার এবং ভূমিহীনদের মাঝেই।

'মঙ্গা' কবলিত ভূমিহীন কৃষিশ্রমিকদের অনেককে দৈনিক মজুরির দাম কত জানতে চেয়ে কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি। সবাই একই কথা জানিয়েছে - তাদের হাতে কোনো কাজ নেই। যেখানে কোনো কাজই নেই, সেখানে শ্রমের মূল্য জানতে চাওয়া যে বোকামি তাও অনেকেই বিভিন্ন কায়দায় বুঝিয়ে দিয়েছে। কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী থানার সদর ইউনিয়নের চান্দারপাড় গ্রামের রিক্সাচালক মুন্নাফ (২৫) বলেন,

> এইবার মঙ্গা বেশি। মানুষের হাতে কাজ নাই। তাই মানুষজনের খুব কষ্ট। কয়দিনে কয়েকটা লোক হাসপাতালে ডায়রিয়ায় মারা গেছে ...এখানের চাইতে ঢাকা, কুমিলণ্ডা-ই ভাল। ওইদিকে কাজ-কাম বেশি।

কুড়িগ্রামের ভরুঙ্গামারী থানার পাটেশ্বরী ব্রিজের পূর্বপাড় বাজারের রিক্সাচালক (নদীভাঙ্গনের শিকার) রহিম উদ্দিন (৩০) বলেন,

> এইবার অভাব বেশি। আমি তো কৃষি কাজ করি। এখন কাজ নাই তাই রিক্সা নিয়া বাইর হই। তা রিক্সাও নাই চলে। মানুষ রিক্সায় কম ওঠে...সবাই মঙ্গার কবলে। কারণ মানুষের হাতে কোনো কাজ নাই।

যখন কাজ পাওয়া যায়, তখনও কৃষি শ্রমের মূল্য এই অঞ্চলে দেশের যেকোনো অঞ্চলে চেয়ে কম। আর তাই ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের অর্থনৈতিক অবস্থা সব সময়ই ঋণাত্মক থাকে, যা তারা সামলে নেয় কম খেয়ে, কম পরে। কিন্তু এই অবস্থায় আশ্বিন-কার্তিক মাসে একেবারে কর্মহীন হওয়ার ফলে তারা সত্যিকার অর্থেই ক্ষুধাপীড়িত হয়ে পড়ে।

কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী, ভূরুঙ্গামারী ও ফুলবাড়ি থানার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে 'মঙ্গা'র চিত্র পাওয়া যায়। বাড়ি বাড়ি ঘুরে জানা গেল নিজ এলাকায় কাজ না পেয়ে প্রান্তিক চাষী ও ভূমিহীন পরিবারের উপার্জনশীল সদস্যরা কাজের সন্ধানে রাজধানী ঢাকাসহ দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় পাড়ি জমিয়েছে। এদের একটা অংশ স্থানীয় শহরে অথবা ঢাকা বা অন্য কোথাও গিয়ে রিক্সা চালায়। আর

অধিকাংশ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে গিয়ে কৃষি শ্রমিক হিসেবে দিন মজুরি করে। ভূরুঙ্গামারী থানার পার্শ্ববর্তী টিলার চর, নয়ারহাট, পাইকেরছড়া, ছিট পাইকেরছড়া, মনিরামপুরসহ বেশ কয়েকটি গ্রাম পরিদর্শন করে এবং এলাকার লোকজনের সাথে কথা বলে জানা যায়, অভাব সর্বত্রই তবে কেবলমাত্র ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকদের অবস্থাই বেশি নাজুক। কারণ তাদের হাতে কাজ নাই। তবে কোনো কোনো এলাকায় 'মঙ্গা' নিয়ে মানুষের মাঝে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়নি। কারণ হিসেবে মনে হয় যে, আশ্বিন-কার্তিক মাসের 'মঙ্গা'র সাথে তারা পরিচিত। তারা 'মঙ্গা' মোকাবেলার জন্য কোনো পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করতে না পারলেও অন্তত 'মঙ্গা'কালীন অভাব-অনটন মেনে নেয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে।

ফুলবাড়ি থানার পার্শ্ববর্তী 'মঙ্গা' কবলিত চন্দ্রঘোনা গ্রামের (আদর্শ পাড়া) লাভলি বেগম (২০), জাহানারা বেগম (২২), আরজিনা বেগম (২০) এবং রাবিয়া বেগম (২৫) এর সাথে কথা বলে অভাবের খবরই পাওয়া গেল। জাহানারা বেগম (২২) বলেন,

> আমাদের মতো গরিব লোকদের সবারই খুব অভাব। আমাদের কোনো হাল-গৃহস্থালী নাই, 'হাতের উপর' চলতে হয় সারা বছর। সেই 'হাত' যখন বন্ধ হয়ে যায়, তখন তাদের কষ্টের সীমা থাকে না।

একই গ্রামের ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক মোসলেম আলী (৩২) বলেন,

> আমাদের অভাব কাটামলার (ফসল কাটার সময়) সময় যেই রকম, কার্তিক মাসেও সেই রকম। সারা বছরই আমাদের অভাব। কারণ আমাদের 'হাতের উপর' চলতে হয়। কামলা-পাইট দিয়ে যা পাওয়া যায়, তাতে কোনো রকমে শাক-ভাত জোটানো যায়। কিন্তু হাত বন্ধ থাকলে আমাদের চলে না।

কুড়িগ্রাম সদর থানার মোগলবাসা ইউনিয়নের ধরলার পারের নিধিরামপুর, কিসেমতপুর ও চর কিষ্ণপুরে যেন দুর্ভিক্ষের চিত্রই পাওয়া গেল। নদী ভাঙ্গনের শিকার শত শত পরিবার ধরলার বাঁধের উপর এবং নিকটবর্তী রাস্তার দুই পাশে কোনো রকমে আশ্রয় করে মানবেতর জীবনযাপন করছে। বাড়ি বাড়ি নিরন্ন শিশু-কিশোর, নারী, বৃদ্ধরা অপরিচিত কাওকে দেখলে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকে। অনেকেই সাহায্যের আশায় হাত পাতে। আবার অনেকেই ক্ষুধার জ্বালায় কাতর হলেও কারো কাছে হাত পাতে না। হাত পেতে তারা অভ্যস্ত নয়। কারণ, কিছুদিন আগেও তাদের জমিজমা, হাল-গৃহস্থালি সবই ছিল! নদীভাঙ্গনের শিকার হয়ে তারা এখন নিঃস্ব। কিসেমতপুর গ্রামের হযরত আলী (৩৫) 'মঙ্গা' সম্পর্কে বলেন,

> প্রতি বছর আশ্বিন-কার্তিক মাসে মঙ্গার প্রধান কারণ হচ্ছে কাজের অভাব। আমন ধান রোপন করার পর মানুষের হাতে আর কোনো কাজ থাকে না। তাই যারা হাতের উপর চলে, তাদের হাতও বন্ধ থাকে, পাতও বন্ধ থাকে।

একই গ্রামের ষাটোর্ধ বৃদ্ধা কাছিরণ বলেন,

> এবার খুব অভাব। ভাত নাই মিলে। হামার কিচ্ছু নাই। ছাওয়ালরা নাই পোষে। মানুষের বাড়িতে কাম করি খাই...এখন মানুষের কাম-কাজ নাই। হাতও না চলে, ভাতও নাই পাই...আলণ্ঢায় না নেয় কে বা? কপালত কিসের দুঃখ করি ধুইছে? এই দু:খ কত ভোগা যায়, এই বয়সে?

মোগলবাসা ইউনিয়নের তিস্ড়া পারের ভেলাকুপা চরের আবুল হোসেন (৪০) বলেন, "গত বছরের চেয়ে এ বছরের মঙ্গা অনেক বেশি। বন্যায় আমন ধান নষ্ট হওয়াতেই এবার এত মঙ্গা।" মোগলবাসা ইউনিয়নের নিধিরামপুর গ্রামের রমজান আলী (৩০) জানান, তিনি সাত বছর টেক্সটাইল (কুড়িগ্রামের একমাত্র টেক্সটাইল মিল) মিলে চাকুরি করেছেন। সরকার মিলটি বন্ধ করে দিয়ে তাকে বাধ্যতামূলক অবসর দিয়েছে। মিলটি বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে ঐ মিলে কর্মরত ৬০০ শ্রমিকের সবাই রমজান আলীর মতো চাকুরি হারিয়েছেন। রমজান আলী জানালেন, একদিকে নদী তার বাড়ি-ঘর, জমিজমা সব ভেঙ্গে নিয়েছে, অন্যদিকে একই সময়ে তিনি চাকুরি হারিয়েছেন। এখন মানুষের জায়গায় ঘর তুলে আছেন। এলাকায় কোনো কাজ নেই। অপরের বাড়িতে স্ত্রী-সন্ড়ান ফেলে দূরে কোথাও কাজ করতেও যেতে পারছেন না। স্ত্রী-সন্ড়ান নিয়ে ভীষণ অভাবে আছেন তিনি।

নীলফামারী জেলার সদর থানার বিভিন্ন এলাকা, ডোমারের বিভিন্ন এলাকা এবং ডিমলা থানার তিস্ড়া ব্যারেজের পার্শ্ববর্তী নদীভাঙ্গন এলাকা ঘুরেও 'মঙ্গা'র প্রায় একই চিত্র পাওয়া গেছে। ভুমিহীন কৃষি শ্রমিক ও প্রান্ড়িক চাষীরা, বিশেষ করে নদী ভাঙ্গনের শিকার নিঃস্ব মানুষেরাই 'মঙ্গা'র শিকার। আর যেহেতু সারা বছর তারা দিন আনে দিন খায় তাই তাদের কোনো সঞ্চয় থাকে না যা দিয়ে তারা 'মঙ্গা' বা অন্য কোনো আপদকালীন সময়ে খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে। তাই প্রতি বছর আশ্বিন-কার্তিক মাসে যখন কাজ থাকে না, তখন তারা 'মঙ্গা'র শিকার হয়।

৮। 'মঙ্গা'র সর্বশেষ পরিস্থিতি

গত দুই/তিন বছরে 'মঙ্গা'র তীব্রতা খানিকটা কমেছে। সংবাদ মাধ্যমে 'মঙ্গা' সংক্রান্ড় মর্মস্পর্শী খবর বা প্রতিবেদন এখন আর তেমন প্রকাশ পায় না। সরকারের পক্ষ থেকেও 'মঙ্গা' নেই বলে দাবী করা হয়। তাই 'মঙ্গা'র সর্বশেষ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার লক্ষ্যে ২০১১ সালে 'মঙ্গা'প্রবণ এলাকা পুনরায় জরিপ করা হয়েছে। এই মাঠকর্মের মাধ্যমে বোঝা যায় যে, কয়েক বছর আগেও 'মঙ্গা'র যে তীব্রতা ছিল তা অনেকাংশে কমেছে। এর পেছনে কিছু সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ যেমন কাজ করেছে, তেমনি অনুকূল আবহাওয়া ও ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশও গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। গত কয়েক বছরে বন্যা হয়নি এবং নদীভাঙ্গন প্রবণতাও কমেছে। 'মঙ্গা'র চরিত্র বিশেণ্ডষণে আমরা দেখেছি যে, নদীভাঙ্গনের শিকার, বন্যা কবলিত, ভূমিহীন মানুষরাই মূলত 'মঙ্গা'র শিকার হয়। সুতরাং 'মঙ্গা'র প্রাকৃতিক চলকগুলোকে বিবেচনায় এনে বলা যায় যে, নদীভাঙ্গন ও বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের অনুপস্থিতি 'মঙ্গা'র তীব্রতা হ্রাসে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে নীলফামারী জেলায় অবস্থিত উত্তরা ইপিজেড একটি গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এখানে ইতোমধ্যেই কয়েক হাজার মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে যা এই এলাকার 'মঙ্গা'র তীব্রতা কমাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে বলে স্থানীয় অধিবাসীদের অনেকেই মত দেন। এছাড়া গত কয়েক বছরে 'মঙ্গা' মোকবেলায় বেশ কিছু সরকারি উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর আওতায় গৃহিত সরকারি কর্মসূচিগুলো তাৎক্ষণিকভাবে 'মঙ্গা' মোকাবেলায় খানিকটা সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে আনার লক্ষ্যে সরকারের চলমান কর্মসূচিসমূহ যেমন - ভিজিএফ, ভিজিডি, কাবিখা/কাবিটা, টেস্ট রিলিফ, বয়স্ক ও বিধবা ভাতা, দরিদ্র মায়ের জন্য মাতৃত্বজনিত ভাতা, চর জীবিকায়ন প্রকল্প, ঝুঁকি নিরসন প্রকল্প ইত্যাদি থেকে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অংশ হিসেবে 'মঙ্গা'ক্রান্ড় মানুষরা উপকার পেয়ে আসছে। এছাড়াও 'মঙ্গা' মোকবেলায় সরকার কিছু নতুন প্রকল্প বাস্ড়বায়ন করছে যার সুফল খানিকটা হলেও দৃষ্টিগোচর হয়।

৮.১। ১০০ দিনের কর্মসৃজন কর্মসূচি

'মঙ্গা' পীড়িত মানুষ ও অতিদরিদ্র বেকার শ্রমিকদের জন্য ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে গৃহিত সরকারের '১০০ দিনের কর্মসৃজন কর্মসূচি' দ্বারা 'মঙ্গা' পীড়িত মানুষ উপকৃত হয়েছে। ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের বাজেটে ২০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়ে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই কর্মসূচিতে প্রায় ২০ লাখ শ্রমিক নিবন্ধন করা হয়। কর্মসূচির প্রথম পর্যায়ে ৯২০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়।[৩] সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী বাস্ড়বায়ন নীতিমালায় কিছু অস্পষ্টতা ও প্রকল্প পরিমাপ সংক্রান্ড় বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা না থাকায় এবং প্রকল্প বাস্ড়বায়নে যথাযথ জবাবদিহিতার ব্যবস্থা না থাকায় এ কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের 'মঙ্গা' পীড়িত মানুষ ও অতিদরিদ্র বেকার শ্রমিকরা কিছুটা উপকৃত হলেও বাস্ড়বায়িত প্রকল্পগুলো গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে কাঙ্খিত অবদান রাখতে সক্ষম হয়নি। ফলে এ কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ বাস্ড়বায়ন না করে কর্মসূচিটি সমাপ্ত করা হয় এবং নতুন করে ফলপ্রসূ কর্মসৃজন কর্মসূচি গ্রহণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ২০০৯-১০ অর্থবছরে 'মঙ্গা'ক্রান্ড় এলাকাসহ দেশের অতি দরিদ্র ৮০টি উপজেলাকে অগ্রাধিকার দিয়ে সারা দেশে 'অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান' (Employment Generation Program for Hardcore Poor) শীর্ষক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। উভয় প্রকল্পে বছরে দুই পর্যায়ে, অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ে সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্যন্ড় তিন মাস এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে মার্চ-এপ্রিল দুই মাস - মোট পাঁচ মাসে (প্রতি মাসে ২০ দিন করে) ১০০ দিনের কর্ম সৃজন করা হয়। 'মঙ্গা' পীড়িত মানুষরা এই প্রকল্প দুটি থেকে উপকৃত হয়েছে। গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নমূলক কাজে নিযুক্ত এসব শ্রমিককে দৈনিক ১০০ টাকা করে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। আর যারা নিবন্ধিত হয়েও কাজ পায়নি তাদেরকে বেকার ভাতা স্বরূপ প্রথম ৩০ দিনে ৪০ টাকা করে এবং অবশিষ্ট ৭০ দিনের জন্য ৫০ টাকা করে দেওয়া হয়। এই প্রকল্প দ্বারা 'মঙ্গা' পীড়িত মানুষ সরাসরি উপকৃত হয়েছে।[৪]

---

[৩] "১০০ দিনের কর্মসৃজন কর্মসূচি বাস্ড়বায়ন নীতিমালা," খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, আগস্ট ২০০৮।

[৪] "অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি বাস্ড়বায়ন নীতিমালা," খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০০৯।

৮.২। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি (National Service Job Sceme)

সরকারের ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচিও 'মঙ্গা' পীড়িত মানুষের ক্ষুধা মোকাবেলায় গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই কর্মসূচির অধীনে তিন মাস মেয়াদি আত্মকর্মসংস্থানের প্রশিক্ষণ (হাঁস-মুরগি পালন, সবজি ও মাছ চাষ) এবং বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে সহযোগী হিসেবে কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ২০১০ সালের ৬ মার্চ শুর" হওয়া এই কর্মসূচির মেয়াদ দুই বছর। এই প্রকল্পের অধীনে ৩১,৬২০ জন উচ্চমাধ্যমিক পাস যুবক ও যুব নারীকে বাছাই করে কম্পিউটার, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা ও শারীরিক শিক্ষা, কৃষি-বন-পরিবেশ, জননিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা, ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদের সেবা কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর ১৯,৬৮২ জনকে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে মাসিক ছয় হাজার টাকা বেতনে চাকুরি দেওয়া হয়েছে (*প্রথম আলো*, ৫ এপ্রিল, ২০১১)। কুড়িগ্রামে নতুন করে আরও ৫৮,২৩৭ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা চলছে। প্রশিক্ষণের পর্যাপ্ততা ও গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানে সেবামূলক কাজে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা সরকারের দুই বছর মেয়াদি এই প্রকল্প শেষ হলে কোথায় কাজ পাবে বা তাদের এই প্রশিক্ষণ আর কোনো কাজে আসবে কি না তা নিয়ে যথেষ্ট শংকা থাকলেও সরকারের এই কর্মসূচি মঙ্গাক্রান্ড় অনেক পরিবারে সাময়িক সস্ড়ি এনে দিয়েছে। যার ফলস্বরূপ বর্তমানে মঙ্গার তীব্রতা অনেকটা কমেছে। পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও (এনজিও) 'মঙ্গা' পীড়িত মানুষের জন্য কিছু কর্মসূচি পরিচালনা করছে।

৮.৩। বিকল্প চাষ পদ্ধতি

বিকল্প চাষ পদ্ধতি এবং 'মঙ্গা'কালীন সময়ের জন্য নতুন জাতের ধান আবিষ্কার 'মঙ্গা' মোকাবেলায় গৃহিত অন্যতম পদক্ষেপ। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় 'মঙ্গা'কালীন সময়ের জন্য বিইউ-ওয়ান (BU-1) নামের নতুন জাতের আমন ধান উদ্ভাবন করেছে। নতুন জাতের এই ধান সাধারণ জাতের আমন ধানের চেয়ে প্রায় একমাস আগেই অর্থাৎ কার্তিক মাসের মাঝামাঝি সময়ে ঘরে আসে। ফলে এই ধান 'মঙ্গা'র তীব্রতা খানিকটা হলেও হ্রাস করবে। সাধারণ জাতের আমন ধান ফলন দিতে সময় নেয় ১৪০-৪৫ দিন আর বিইউ-ওয়ান ফলন দিতে সময় নেয় মাত্র ১১০-১২ দিন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসাব মতে, এই ধানের উৎপাদন খরচ কম এবং হেক্টর প্রতি এর ফলন পাঁচ টন। 'মঙ্গা'ক্রান্ড় এলাকায় এই ধান উৎপাদন হচ্ছে।

কুড়িগ্রাম জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার বেলাবো গ্রামসহ অন্যান্য এলাকার বিস্ড়ীর্ণ বালুচরে সম্প্রতি সরকার ও ডিএফআইডি'র সহায়তায় মিষ্টি কুমড়ার চাষ করে কৃষকরা তাদের অভাব খানিকটা হলেও দূর করতে পেরেছে। নদী ভাঙ্গন ও বালি জমার কারণে এই এলাকার কৃষকরা অনেক বছর তাদের জমি চাষ করতে পারেনি। মিষ্টি কুমড়া চাষের মতো এমন একটি বিকল্প চাষ পদ্ধতি এই অঞ্চলের মানুষদের 'মঙ্গা' দূরীকরণে আশাব্যঞ্জক ভূমিকা রাখতে চলেছে।

৯। শেষ কথা

'মঙ্গা'র অতীত ও বর্তমান প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা এবং এ সংক্রান্ড় মাঠ জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে যে বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা যায় তা হলো, কেবলমাত্র দীর্ঘস্থায়ী দারিদ্র্যগ্রস্ড় প্রান্ড়িক চাষী ও ভূমিহীন কৃষিশ্রমিকরাই 'মঙ্গা'ক্রান্ড়, যাদের একটি বড় অংশই নদী ভাঙ্গনের শিকার। এসব মানুষের মধ্যে যাদের পরিবারের অনুপার্জনশীল মানুষের সংখ্যা বেশি তাদের অবস্থাই বেশি নাজুক। নদীর ধারে,

রাস্ড়া বা বাঁধের উপর আশ্রয় নেয়া, 'হাতের উপর চলা' এইসব মানুষরা সারা বছর কোনো রকমে খাদ্য জোটাতে পারলেও, আশ্বিন-কার্তিক মাসে যখন কোনো কাজ থাকে না তখন তারা তীব্রভাবে ক্ষুধাক্রান্ড় হয়। আর এটাই 'মঙ্গা'র প্রকৃত বাস্ড়বতা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, প্রান্ড়িক চাষী ও ভূমিহীন কৃষিশ্রমিকদের দীর্ঘস্থায়ী দারিদ্র্য এবং আশ্বিন-কার্তিক মাসে কাজের অভাব-ই 'মঙ্গা'র মূল কারণ। তাই 'মঙ্গা'র কবল থেকে এইসব মানুষকে রক্ষা করতে হলে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের দারিদ্র্য দূর করতে হবে। পাশাপাশি এই মৌসুমে বিশেষ কিছু সাময়িক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৮৭৬ সালের দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে পাটনা বিভাগের কমিশনার Scarcity and Relief Department-এর সচিবকে লেখা এক সরকাররি চিঠিতে লিখেছিলেন, "এ সকল এলাকাতে খরার কারণে খাদ্যশস্য উৎপাদিত না হলেও প্রচুর পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য রয়েছে কিন্তু তার পরেও এখানে চরম দারিদ্র্য বিদ্যমান। অন্য কথায় একটি বড় শ্রেণির মানুষজনের ক্রয় করার সামর্থ্য নেই। তাই সরকারি পদক্ষেপ নিতে হলে এ দারিদ্র্যের বির"দ্ধে নিতে হবে। যদি বৃহৎ আঙ্গিকে কাজের বন্দোবস্ড় করা না যায় ... তাহলে প্রতি বছরই বড় ধরনের দুর্দশা, অনাহার দেখা দিবে এবং তা ভাদই-মৌসুম পর্যন্ড় চলবে।"[৮] বর্তমান 'মঙ্গা'র ক্ষেত্রেও একই ধরনের সুপারিশ প্রযোজ্য যদিও প্রেক্ষাপট অনেকটাই আলাদা। 'মঙ্গা' পীড়িত মানুষের সাথে কথা বলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তারা রিলিফ নয়, কাজ চায়। কুড়িগ্রামের কিসেমতপুর গ্রামের হযরত আলী (৩৫) যেমন বলেন,

> আমি রিলিফ চাই না। আমি প্রতিদিন কাজ করতে চাই। কম হলেও যেন আমি আয় করতে পারি। আমাকে যেন হাত গুটিয়ে বসে থাকতে না হয়।

সুতরাং এইসব ভূমিহীন, নদীভাঙ্গনের শিকার, কর্মহীন মানুষকে স্থায়ীভাবে পুনবার্সিত করতে হবে এবং তাদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। 'মঙ্গা'ক্রান্ড় মানুষদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, তাদেরকে কর্মক্ষম ও আত্মনির্ভরশীল করে তোলার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা গ্রহণ করা যেতে পারে:

প্রথমত, 'মঙ্গা'ক্রান্ড় অঞ্চলে কৃষি উৎপাদনে বৈচিত্র্য আনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান উভয়ই বৃদ্ধি করা সম্ভব। 'মঙ্গা' মোকাবেলায় ইতোমধ্যেই সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে কিছু বিকল্প চাষ চালু হয়েছে। কিন্তু 'মঙ্গা'ক্রান্ড় মানুষের সংখ্যার তুলনায় তা এখনও পর্যন্ড় খুবই সামান্য। বিকল্প চাষ ব্যবস্থা আরও ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে প্রান্ড়িক চাষীদের পুঁজি, কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ এবং প্রয়োজনীয় সার, বীজের যোগান দিয়ে সহায়তা করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, 'মঙ্গা'ক্রান্ড় এলাকায় যে সব খাস জমি আছে তা ভূমিহীনদের মাঝে বিতরণ করতে হবে। সরকারি জমি বন্দোবস্ড় দিয়ে প্রান্ড়িক চাষী ও ভূমিহীন কৃষিশ্রমিকদের যৌথ উদ্যোগে সমবায়ভিত্তিক কৃষি খামার গড়ে তোলা হলে তা শুধু 'মঙ্গা' মোকাবেলায় নয়, দারিদ্র্য দূরীকরণেও সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

---

[৮] Statistical Department, Draught no. 149D, 17th July 1876)।

তৃতীয়ত, ভূমির স্বল্পতার বিষয়টি মাথায় রেখে কার্যকর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে বিকল্প পেশায় দক্ষ করে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে সহজেই সমবায়ভিত্তিক গবাদি পশুর খামার এবং হাঁস-মুরগির খামার গড়ে তোলা যেতে পারে। সর্বোপরি এলাকাভিত্তিক শ্রমঘন শিল্পকারখানা গড়ে তুলে স্থায়ীভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

উদ্দিন, মোনাজাত (১৯৯৬): *লক্ষীটারী*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

খান, আকবর আলী (১৯৯২): "সোনার বাংলা মিথ ও বাস্ড়বতা," ইসলাম, সিরাজুল (সম্পা.) *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা।

মুখোপাধ্যায়, সুধীর ও ঘোষ, নৃপেণ (১৯৮৫): *রংপুর জেলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস ও পার্টি*, মহীতোষ, হুগলী।

মেহেদী, এ.টি.এম. সাইফুলণ্ঢাহ (অপ্রকাশিত), (২০০০-২০০১): "মঙ্গা' পরিবেশেনের রাজনীতি ও দৈনন্দিন চর্চা: কেস কুড়িগ্রামের একটি চর," মাঠ গবেষণাপত্র, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

রহমান, হোসেন জিলণ্ঢুর (১৯৯১): "মরা কার্তিকের আলেখ্যঃ মৌসুমী ঘাটতি ও গ্রামীণ দরিদ্রের বিপন্নত,া" *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা*, নবম খ , বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৯৮, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা।

শাহ রুমী, আবু মোঃ ইকবাল (২০০০): "বৃটিশ আমলে রংপুরে দুর্ভিক্ষ," হোসেন, মোয়াজ্জেম (সম্পাদিত), *রংপুর জেলার ইতিহাস*, রংপুর জেলা প্রশাসন, রংপুর।

Buckland, C. E. (1902): *Bengal Under the Lieutenant Governors*, Vol. II, Calcutta.

Chakraborty, R. Lal. (1988): "Rural Indebtedness in Bengal 1935-1947," (unpublished Ph.D dissertation), University of Dhaka.

Chawla, A.l (2005): *The Great Holocaust of Bengal*.

http://www.samarthbharat.com/bengalholocaust.htm;accessed 30/05/2008.

Davis, M. (2000): *Late Victorian Holocausts: El Niño Famines and the Making of the Third World,* London: Verso.

Floud, F. (1940): *Report of the Land Revenue Commission* (popularly known as Floud Commission), Government of Bengal, Vol. 5, Table VIII (b), Alipore, Bengal Government Press.

Fraser, L. (1911): *India Under Carzon & After*, London.

Habib, I. (1963): *The Agrarian System of Mughal India 1556-1707*, Asia Publishing House London.

Hartley, A.C. (1940): *Final report of thr Rangpur Survey and Settlement Operations, 1931-1938*, Alipore, Bengal Government Press.

Hossain, M. (1989): G*reen Revolution in Bangladesh*, University Press Ltd., Dhaka.

Hunter, W. W. (1876): *A Statistical Account of Bengal*, *Districts of Maldah, Rangpur and Dinajpur;* vol. 8, Trubner & Co. London.

Husain, S. I. (1908): *Final Report on The Survey and Settlement of Four Private Estates in the District of Rangpur, 1903-1907*, East Bengal and Assam Secretariat Press.

Siddiqui, A. (1972): *Bangladesh District Gazetteers, Dinajpur*, Bangladesh Governor Press, Dacca.

Ishaque, H. S. M. (1946): *Agriciltural Statistics by Plot to Plot Enumeration in Bengal, 1944-45*, Part-I, Alipore.

Islam, S. (1992): "Permanent Settlement and Peasant Economy," in: Sirajul Islam (ed.), *History of Bangladesh 1704-1971*, Vol. 2, Dhaka.

Khan, Islam N. (Ed.), (1977): *Bangladesh District Gazetteers, RANGPUR*, Bangladesh Government Press Dacca (henceforth referred to as BDG).

Rahman, M. M. (unpublished) "Village Life in Colonial Bengal: Change and Continuity in Rangpur District, 1870-1940" (PhD Dissertation), 1988, Institute of Bangladesh Studies, University of Rajshahi.

Sen, A. (1981): *Poverty and Famine*; Oxford University Press, New Delhi.